بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বই নং ৪৬। www.motaher21.net

اقۡتَتَلُوا

" দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে! "

" Fall in to fighting!"

সুরা: আল-হুজুরাত

আয়াত নং :-9

وَ اِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَہُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىہُمَا عَلَی الۡاُخۡرٰی فَقَاتِلُوا الَّتِیۡ تَبۡغِیۡ حَتّٰی تَفِیۡٓءَ اِلٰۤی اَمۡرِ اللّٰہِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَہُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنَ

ঈমানদারদের মধ্যকার দু’টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দু’টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।

শানে নুযূল :

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলা হলো যদি আপনি ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর নিকট একবার যেতেন।

অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাধার ওপর সওয়ার হয়ে চললেন এবং সাহাবীরাও তাঁর সাথে গেলেন। যখন তাঁরা ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর নিকট পৌঁছলেন তখন সে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল : আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ তা‘আলার শপথ! আপনার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তার এ কথা শুনে আনসারদের মধ্য হতে একজন সাহাবী বললেন : আল্লাহ তা‘আলার শপথ! তোমার মুখের গন্ধের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গাধার গন্ধ বহুগুণে উত্তম ও পবিত্র। তাঁর এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই-এর গোত্রের লোকেরা ভীষণ রেগে গেল। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণও রেগে গেলেন। উভয়দল হাতাহাতি, খেজুরের ডাল ও জুতো দিয়ে মারামারি শুরু করে দিলো। ফলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী হা. ২৬৯১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : আয়াতটি আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তারা আনসারদের বিরুদ্ধে লাঠি ও জুতো দিয়ে মারামারি করছিল।

মু’মিনরা পরস্পর দীনি ভাই। এ সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের চেয়েও সুদৃঢ়। একজন মু’মিন সর্বদা অন্য মু’মিনের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করবে, ভুল-ত্র“টিসমূহ মার্জিত ভাষায় সংশোধন করে দেবে, অন্যায় হলে ক্ষমা করে দেবে। অন্যায় ও অবিচার করবে না, বিপদে পড়লে সহযোগিতা করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। তার প্রতি জুলুম করবে না, অপমান করবে না, তুচ্ছ মনে করবে না। একজন ব্যক্তির অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে তুচ্ছ মনে করবে। একজন মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান হরণ করা হারাম। (সহীহ মুসলিম হা. ৬৭০৬)

অপর বর্ণনায় এসেছে : যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির দুনিয়ার কোন কষ্ট দূর করে দেবে আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করে দেবেন এবং দোষ গোপন করলে আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (সহীহ বুখারী হা. ২৪৪২)

তাই সমাজে বা দেশে বসবাসকালে একজন বা একদল মু’মিন অন্য একজন বা একদল মু’মিনের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিবাদে লিপ্ত হলে উচিত হলো মীমাংসা করে দেয়া। অবশ্যই যেন এ মীমাংসা ন্যায়পরায়ণতার সাথে হয়। এর ফলে সমাজে ও দেশে শান্তি নেমে আসবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَي مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ

ন্যায় বিচারকারীরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার ডান-দিকে নূরের আসনে উপবিষ্ট থাকবে। (মুসনাদ আহমাদ হা. ৬৪৯২)

সুতরাং মু'মিনদের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিবাদ হতেই পারে, তাই বলে সে বিবাদকে কেন্দ্র করে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবে না, বহিঃশত্র" প্রবেশ করিয়ে পরিবেশ নষ্ট করা যাবে না। বরং যথাসম্ভব নিজেরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দেবে।

তাফসীর :

আল্লাহ একথা বলেননি, যখন ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি গোষ্ঠী পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় বরং বলেছেন, "যদি ঈমানদারদের দু'টি দল একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।" একথা থেকে স্বতঃই বুঝা যায় যে, পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের নীতি ও স্বভাব নয় এবং হওয়া উচিতও নয়। মু'মিন হয়েও তারা পরস্পর লড়াই করবে এটা তাদের কাছ থেকে আশাও করা যায় না। তবে কখনো যদি এরূপ ঘটে তাহলে সেক্ষেত্রে এমন কর্মপন্থা করা উচিত যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে। তাছাড়া দল বুঝাতেও فرقة শব্দ ব্যবহার না করে طائفة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় فرقة বড় দলকে এবং طائفة ছোট দলকে বুঝায়। এ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটি একটি চরম অপছন্দনীয় ব্যাপার। মুসলমানদের বড় বড় দলের এতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাও উচিত নয়।

এ নির্দেশ দ্বারা এমন সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা উক্ত বিবদমান দল দু'টিতে শামিল নয় এবং যাদের পক্ষে যুদ্ধমান দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া সম্ভব। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর লড়াই করতে থাকবে আর মুসলমান নিষ্ক্রিয় বসে তামাশা দেখবে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা মুসলমানের কাজ নয়। বরং এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তাতে সমস্ত ঈমানদার লোকদের অস্থির হয়ে পড়া উচিত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণে যার পক্ষে যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব তাকে তা করতে হবে। উভয় পক্ষের লড়াই থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করবে। বিবাদের কারণসমূহ জানবে এবং নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সব রকম প্রচেষ্টা চালাবে।

অর্থাৎ এটাও মুসলমানের কাজ নয় যে, সে অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেবে এবং যার প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে কিংবা অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, যুদ্ধরত দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধি করানোর সমস্ত প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী কে এবং অত্যাচারী কে? যে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী তাকে সহযোগিতা করবে। আর যে অত্যাচারী তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যেহেতু এ লড়াই করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তাই তা ওয়াজিব এবং জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। এটা সেই ফিতনার অন্তর্ভুক্ত নয় যার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেনঃ

الْقَائِمِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

সে ফিতনার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলতে থাকা ব্যক্তির চেয়ে এবং বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। কারণ, সে ফিতনার দ্বারা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার সে লড়াইকে বুঝানো হয়েছে উভয় পক্ষের মাঝে গোত্র প্রীতি, জাহেলী সংকীর্ণতা এবং পার্থিব স্বার্থ অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে সংঘটিত হয় এবং দু'পক্ষের কেউই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের সহযোগিতার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তা ফিতনার অংশ গ্রহণ করা নয়। বরং আল্লাহর আদেশ মান্য করা। এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত এবং ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না। (আহকামুল কুরআন-জাসসাস) এমনকি কিছু সংখ্যক ফকীহ একে জিহাদের চাইতেও উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের যুক্তি হলো, হযরত আলী (রা.) তাঁর গোটা খেলাফতকাল কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিবর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়ে দিয়েছেন। (রুহুল মাআনী)। এ ধরনের লড়াই ওয়াজিব নয় বলে কেউ যদি তার সপক্ষে এই বলে যুক্তি পেশ করে যে, হযরত আলীর (রা.) এসব যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আরো কতিপয় সাহাবী অংশ গ্রহণ করেননি তাহলে সে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। ইবনে উমর নিজেই বলেছেনঃ

ما وجدت فى نفسى من شئ ما وجدت من هذه الاية انى لم اقاتل هذه الفئة الباغية كما امرنى الله تعالى – (المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصابة , باب الدفع عمن قعدوا عن بيعة على)

"কোন বিষয়ে আমার মনে এতটা খটকা লাগেনি যতটা এ আয়াতের কারণে লেগেছে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমি ঐ বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।"সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ এটাই নয় যে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেই হবে এবং তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা এবং এর মূল উদ্দেশ্য তার অত্যাচার নিরসন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরনের শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং যতটা শক্তি প্রয়োগ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে যথেষ্ট তার চেয়ে কম শক্তিও প্রয়োগ করবে না আবার বেশীও প্রয়োগ করবে না। এ নির্দেশে সেই লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা শক্তি প্রয়োগ করে অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন নিরসন করতে সক্ষম।

এ থেকে বুঝা যায়, এ যুদ্ধ বিদ্রোহী (সীমালংঘনকারী দল) কে বিদ্রোহের (সীমালংঘনের) শাস্তি দেয়ার জন্য নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য। আল্লাহর নির্দেশ অর্থ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুসারে যা ন্যায় বিদ্রোহী দল তা মেনে নিতে উদ্যোগী হবে এবং সত্যের এ মানদণ্ড অনুসারে যে কর্মপন্থাটি সীমালঙ্ঘন বলে সাব্যস্ত হবে তা পরিত্যাগ করবে। কোন বিদ্রোহী দল যখনই এ নির্দেশ অনুসরণ করতে সম্মত হবে তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। কারন, এটিই এ যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এরপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে সে-ই সীমালংঘকারী। এখন কথা হলো, আল্লাহর

কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুসারে কোন বিবাদে ন্যায় কি এবং অন্যায় কি তা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে তাদেরই কাজ যারা ও উম্মতের মধ্যে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির দিক দিয়ে বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করার যোগ্য।

শুধু সন্ধি করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সন্ধি করিয়ে দেয়ার। এ থেকে বুঝা যায় হক ও বাতিলের পার্থক্যকে উপেক্ষা করে শুধু যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যে সন্ধি করানো হয় এবং যেখানে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী দলকে অবদমিত করে সীমালংঘনকারী দলকে অন্যায়ভাবে সুবিধা প্রদান করানো হয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই। সে সন্ধিই সঠিক যা ন্যায় বিচারের ওপর ভিত্তিশীল। এ ধরনের সন্ধি দ্বারা বিপর্যয় দূরীভূত হয়। তা না হলে ন্যায়ের অনুসারীদের অবদমিত করা এবং সীমালংঘনকারীদের সাহস ও উৎসাহ যোগানের অনিবার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, অকল্যাণের মূল কারণসমূহ যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। এমনকি তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা থেকে বার বার বিপর্যয় সৃষ্টির ঘটনা ঘটতে থাকে।

এ আয়াতটি মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে শরয়ী বিধানের মূল ভিত্তি। একটি মাত্র হাদিস (যা আমরা পরে বর্ণনা করব) ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে এ বিধানের আর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ, নবীর ﷺ যুগে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মত কোন ঘটনাই কখনো সংঘটিত হয়নি যে, তাঁর কাজ ও কথা থেকে এ বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। পরে হযরত আলীর (রা.) খিলাফত যুগে যখন মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হয় তখন এ বিধানের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া হয়। তখন যেহেতু বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামে বর্তমান ছিলেন তাই তাদের কর্মকাণ্ড ও বর্ণিত আদেশ থেকে ইসলামী বিধানের এ শাখার বিস্তারিত নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে হযরত আলীর (রা.) নীতি ও কর্মপন্থা এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহবিদদের কাছে মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়। নিচে আমরা এ বিধানের একটি প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করছিঃএকঃ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের কয়েকটি ধরন হতে পারে এবং প্রতিটি ধরন সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান বিভিন্নঃ(ক) যুদ্ধরত দু'টি দল যখন কোন মুসলিম সরকারের প্রজা হবে তখন তাদের সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া কিংবা তাদের মধ্যে কোন্ দলটি সীমালংঘনকারী তা নির্ণয় করা এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে ন্যায় ও সত্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।(খ) যুদ্ধরত দু'পক্ষই যখন দু'টি বড় শক্তিশালী দল হবে কিংবা দু'টি মুসলিম সরকার হবে এবং উভয়ে পার্থিব স্বার্থের জন্য লড়াই চালাবে তখন মু'মিনদের কাজ হলো এ ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকা এবং উভয় পক্ষকেই আল্লাহর ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে থাকা।(গ) যুদ্ধরত যে দু'টি পক্ষের কথা ওপরে (খ) অংশে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি পক্ষ যদি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর অপর পক্ষ যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকে এবং আপোষ মীমাংসায় রাজী না হয় সেক্ষেত্রে ঈমানদারদের কর্তব্য সীমালংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে ন্যায়পন্থী দলের পক্ষ অবলম্বন করা।(ঘ) উভয় পক্ষের একটি পক্ষ যদি প্রজা হয় আর তারা সরকার অর্থাৎ মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে তাহলে ফিকাহবিদগণ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী এ দলকেই তাদের পরিভাষায় বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।দুইঃ বিদ্রোহী অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী গোষ্ঠীও

নানা রকম হতে পারেঃ (ক) যারা শুধু হাংগামা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছে। এ বিদ্রোহের স্বপক্ষে তাদের কাছে কোন শরীয়াত সম্মত কারণ নেই। এ ধরনের দল ও গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সর্বসম্মত মতে বৈধ এবং এক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সরকার ন্যায়বান হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। (খ) যেসব বিদ্রোহী সরকারকে উৎখাতের জন্য বিদ্রোহ করে। কিন্তু এজন্য তাদের কাছে শরীয়াত সম্মত কোন যুক্তি নেই। বরং তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তারা জালেম ও ফাসিক। এক্ষেত্রে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে সমর্থন করা বিনা বাক্য ব্যয়ে ওয়াজিব। কিন্তু সে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠা নাও হয় তবুও তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করা ওয়াজিব। কারণ সেই সরকারের জন্যই রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা টিকে আছে। (গ) যারা নতুন কোন শরয়ী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা বাতিল এবং আকীদা ফাসেদ; যেমন খারেজীদের আকীদা ও ব্যাখ্যা। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিম সরকারের তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বৈধ অধিকার আছে। সে সরকার ন্যায়নিষ্ঠা হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। আর এ সরকারকে সমর্থন করাও ওয়াজিব। (ঘ) যারা এমন কোন ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যার প্রধানের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বৈধভাবে কায়েম হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের কাছে শরীয়াত সম্মত কোন ব্যাখ্যা থাক বা না থাক সরকারের সর্বাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ এবং তাদের সমর্থন করা ওয়াজিব। (ঙ) যারা এমন একটি জালেম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে যার নের্তৃত্ব জোর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যার নেতৃবৃন্দ ফাসেক। কিন্তু বিদ্রোহকারীগণ ন্যায়নিষ্ঠ। তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকেও প্রতিভাত হচ্ছে, যে তারা সৎ ও নেককার। এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে 'বিদ্রোহী' অর্থাৎ সীমালংঘকারী বলে আখ্যায়িত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে চরম মতবিরোধ হয়েছে। এ মতবিরোধের বিষয়টি আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি। অধিকাংশ ফিকাহবিদ এবং আহলে হাদীসের মত হচ্ছে যে, নেতার নেতৃত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রে শান্তি, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় আছে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও অত্যাচারী যাই হয়ে থাকুন না কেন এবং তাঁর নেতৃত্ব যেভাবেই কায়েম হয়ে থাকুক না কেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। তবে তিনি সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে তা ভিন্ন কথা। ইমাম সারাখসী লিখেছেনঃ মুসলমানগণ যখন কোন শাসকের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে এবং তার কারণে শান্তি লাভ করে ও পথঘাট নিরাপদ হয় এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কোন দল বা গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যার যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে এমন লোকদের মুসলমানদের ঐ শাসকের সাথে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। (আল মাবসূত, খাওয়ারেজ অধ্যায়) ইমাম নববী শরহে মুসলিম বলেনঃ নেতা অর্থাৎ মুসলিম শাসকবৃন্দ জালেম এবং ফাসেক হলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করা হারাম। এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে ইমাম নববী দাবী করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে দাবী করা ঠিক নয়। মুসলিম ফিকাহবিদদের একটি বড় দল যার মধ্যে বড় বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত অন্তর্ভুক্ত বিদ্রোহকারীদের কেবল তখনই বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন যখন তারা ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জালেম ও ফাসেক নেতাদের বিরুদ্ধে সৎ ও নেককার লোকদের অবাধ্যতাকে তারা কুরআন মজীদের পরিভাষা অনুসারে বিদ্রোহের নামান্তর বলে আখ্যায়িত করেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব বলেও মনে করেন না। অত্যাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার মতামত বিষয়ে জ্ঞানীগণ সম্যক অবহিত। আবু বকর জাস্সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় লিখছেন যে, ইমাম সাহেব এ যুদ্ধকে শুধু জায়েজই মনে করতেন না বরং অনুকূল পরিস্থিতিতে ওয়াজিব বলে মনে করতেন। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৮১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৯) বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়েদ ইবনে আলীর বিদ্রোহে তিনি যে শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও তা করতে উপদেশ দিয়েছেন। (আল জাস্সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১)। মনসূরের বিরুদ্ধে

নাফসে যাকিয়ার বিদ্রোহে তিনি পুরোপুরি সক্রিয়ভাবে নাফসে যাকিয়াকে সাহায্য করেছেন। সেই যুদ্ধকে তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। (আল জাস্সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১; মানাকেবে আবী হানীফা, আল কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭১-৭২) তাছাড়ও ইমাম সারাখসী যে সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন তা হানাফী ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত মত নয়। হিদায়ার শরাহ ফাতহুল কাদীরে ইবনে হুমাম লিখেছনঃ الباغی فی عرف الفقهاء الخارج عن طاعة امام الحق "সাধারণভাবে ফিকাহবিদদের মতে বিদ্রোহী সে-ই যে ন্যায় পরায়ণ ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।"হাম্বলীদের ইবনে আকীল ও ইবনুল জুযী ন্যায়নিষ্ঠ নয় এমন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জায়েজ বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে তারা হযরত হুসাইনের বিদ্রোহকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। (আল ইনসাফ, ১০, খণ্ড, বাবু কিতালী আহলিল বাগী) ইমাম শাফেয়ী তাঁর কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে সে ব্যক্তিকে বিদ্রোহী বলে মত প্রকাশ করেছেন, যে ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (৪খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৫) মুদাওয়ানা গ্রন্থে ইমাম মালেকের মত উদ্ধৃত হয়েছে যে, বিদ্রোহী যদি ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭) কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআনে তাঁর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, যদি কেউ উমর ইবনে আবদুল আযীযের মত ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। তাঁর চেয়ে ভিন্নতর কোন ইমাম সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় তাকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা অপর কোন জালেম দ্বারা তাকে শাস্তি দেবেন এবং তৃতীয় কোন জালেম দ্বারা তাদের উভয়কে আবার শাস্তি দেবেন। তিনি ইমাম মালেকের আরো একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে, এক শাসকের কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়ে থাকলে তার ভাইও যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার বিরুদ্ধেও লড়াই করা হবে যদি সে ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হয়। আমাদের সময়ের ইমাম বা নেতাদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের কোন বাইয়াত ব আনুগত্য শপথই নেই। কারণ, জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের পক্ষে শপথ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সাহনুনের বরাত দিয়ে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী উলামাদের যে রায় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, যুদ্ধ কেবল ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের সহযোগিতার জন্যই করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রথম বাইয়াতকৃত ইমাম ন্যায়নিষ্ঠ হোক কিংবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকারী ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠ হোক তাতে কিছু এসে যায় না। দু'জনের কেউই যদি ন্যায়নিষ্ঠ না হয় তাহলে দু'জনের থেকেই দূরে থাকো। তবে যদি তোমার নিজের জীবনের ওপর হামলা হয় কিংবা মুসলমানগণ জুলুমের শিকার হয় তাহলে প্রতিরোধ করো। এ মত উদ্ধৃত করার পর কাজী আবু বকর বলেনঃ لانقاتل الامع امام عادل يقدمه اهل الحق لانفسهم "সত্যের অনুসারীগণ যাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাকে ছাড়া আর কারো জন্য আমরা যুদ্ধ করবো না।"তিনঃ বিদ্রোহীরা যদি স্বল্প সংখ্যক হয়, কোন বড় দল তাদের পৃষ্ঠপোষক না থাকে এবং তাদের কাছে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম বেশী না থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ সম্পর্কিত আইন প্রযোজ্য হবে না। তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ আইন প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ তারা যদি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তাহলে কিসাস গ্রহণ করা হবে এবং আর্থিক ক্ষতি সাধন করে থাকলে জরিমানা আদায় করা হবে। যেসব বিদ্রোহী কোন বড় রকমের শক্তির অধিকারী এবং অধিকতর সংগঠনিক ক্ষমতা ও বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে বিদ্রোহ করবে বিদ্রোহ বিষয়ক আইন-কানুন কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।চারঃ বিদ্রোহীরা যতক্ষণ শুধু তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস অথবা সরকার ও সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহাত্মক ও শত্রুতামূলক ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করতে থাকবে ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করা যাবে না। যখন তারা কার্যত সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে কেবল তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। (আল মাবসূত-বাবুল খাওয়ারিজ, ফাতহুল কাদির-বাবুল বুগাত, আহকামুল কুরআন,-জাস্সাস)।পাঁচঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে ইনসাফ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার আহবান জানানো হবে। তাদের যদি কোন সন্দেহ-সংশয় এবং প্রশ্ন থাকে তাহলে যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দূর করার চেষ্টা করা হবে। তা সত্বেও যদি তারা বিরত না হয় এবং তাদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধ শুরু

করা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে। (ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন-জাস্সাস)।ছয়ঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বরাত দিয়ে হাকেম, বায্যার ও আল জাস্সাস বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নবী ﷺ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে উম্মে আবদের পুত্র, এ উম্মতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কি তা কি জান?" তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেনঃ তাদের আহতদের ওপর আঘাত করা হবে না, বন্দীদের হত্যা করা হবে না, পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা হবে না এবং তাদের সম্পদ গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না।" এ নীতিমালার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি ও কর্ম সমস্ত ফিকাহবিদ এ উক্তি ও আমলের ওপর নির্ভর করেছেন। উষ্ট্র যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করলেনঃ পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করো না, আহতদের আক্রমণ করো না, বন্দীদের হত্যা করো না, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকে নিরাপত্তা দান করো, মানুষের বাড়ীঘরে প্রবেশ করো না এবং গালি দিতে থাকলেও কোন নারীর ওপর হাত তুলবে না। হযরত আলীর সেনাদলের কেউ কেউ দাবী করলো যে, বিরোধী ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের দাস বানিয়ে বন্টন করে দেয়া হোক। হযরত আলীর (রা.) একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশাকে তার নিজের অংশে নিতে চাও?সাতঃ হযরত আলীর (রা.) অনুসৃত নীতি ও আদর্শ থেকে বিদ্রোহীদের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে যে বিধান গৃহীত হয়েছে তা হচ্ছে, তাদের সম্পদ সেনাবাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাক কিংবা বাড়ীতে থাক এবং সম্পদের মালিক জীবিত হোক বা মৃত হোক কোন অবস্থায়ই তা গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং সৈন্যদের মধ্যে বন্টনও করা যাবে না। তবে যে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী নয়। যুদ্ধ শেষ হলে এবং বিদ্রোহী স্তিমিত হওয়ার পর তাদের সম্পদ তাদেরকেই ফেরত দেয়া হবে। যুদ্ধ চলাকালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন যদি হস্তগত হয় তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ওগুলোকে বিজয়ীদের মালিকানাভুক্ত করে গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না এবং পুনরায় তাদের বিদ্রোহ করার আংশকা না থাকলে ঐ সব জিনিসও তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। শুধু ইমাম আবু ইউসুফের মত হচ্ছে, সরকার ঐ সব সম্পদ গনীমত হিসেবে গণ্য করবেন। (আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর, আল জাস্সাস)।আটঃ পুনরায় বিদ্রোহ করবে না এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দেয়া হবে। (আল মাবসূত)।নয়ঃ নিহত বিদ্রোহীদের মাথা কেটে প্রদর্শন করা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। কারণ তা মৃতদেহ বিকৃতকরণ। রসূলুল্লাহ ﷺ এক কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এক রোমান বিশপের মাথা কেটে হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে আনা হলে তিনি তাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেনঃ রোমার ও ইরানীদের অন্ধ অনুসরণ আমাদের কাজ নয়। সুতরাং কাফেরদের সাথে যেখানে এরূপ আচরণ করা গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে মুসলমানদের সাথে এরূপ আচরণ আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। (আল মাবসূত)।দশঃ যুদ্ধকালে বিদ্রোহীদের যেসব প্রাণ ও সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে যুদ্ধ শেষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার কোন কিসাস বা ক্ষতিপূরণ তাদের ওপর বর্তাবে না। ফিতনা ও অশান্তি পুনরায় যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য কোন নিহতের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন সম্পদের জন্য তাদের জরিমানাও করা যাবে না। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক লড়াইয়ে এ নীতিমালাই অনুসরণ করা হয়েছিলো। (আল মাবসূত, আল জাস্সাস, আহকামুল কুরআন,---ইবনুল আরাবী)।এগারঃ যেসব অঞ্চল বিদ্রোহীদের করতলগত হয়েছে এবং সেখানে তারা নিজেদের প্রশাসন চালু করে যাকাত এবং সরকারী কর ইত্যাদি আদায় করে নিয়েছে, সরকার ঐ সব অঞ্চল পুনর্দখলের পর জনগণের কাছে পুনরায় উক্ত যাকাত ও কর দাবী করবে না। বিদ্রোহীরা যদি উক্ত অর্থ শরীয়াতসম্মত পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে আদায়কারীদের পক্ষ থেকে তা আল্লাহর কাছেও আদায়কৃত বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারা যদি উক্ত সম্পদ শরীয়াতসম্মত নয় এমন পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে তা প্রদানকারী এবং আল্লাহর

মধ্যকার ব্যাপার। তারা চাইলে পুনরায় যাকাত আদায় করতে পারে। (ফাতহুল কাদীর, আল জাস্সাস,---ইবনুল আরাবী)।বারঃ বিদ্রোহীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে যেসব বিচারালয় কায়েম করেছিল তার বিচারক যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন এবং শরীয়াত অনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে থাকেন তাহলে তাদের নিয়োগকারীরা বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হলেও তা বহাল রাখা হবে। কিন্তু তাদের ফায়সালা যদি শরীয়াতসম্মত না হয় এবং বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে সরকারের বিচারালয়ে বিচারের জন্য হাজির করা হয় তাহলে তাদের ফায়সালাসমূহ বহাল রাখা হবে না। তাছাড়া বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়সমূহের পক্ষ থেকে জারী করা ওয়ারেন্ট বা হুকুমনামা সরকারের আদালতে গৃহীত হবে না। (আল মাবসূত, আল জাস্সাস)।তেরঃ ইসলামী আদালতসমূহে বিদ্রোহীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ন্যায় ও ইনসাফের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফাসেকীর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মাদ বলেনঃ যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ করবে এবং ন্যায়ের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহে লিপ্ত হবে ততক্ষণ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু একবার তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে আমি আর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবো না। (আল জাস্সাস)।এসব বিধান থেকে মুসলমান বিদ্রোহী এবং কাফের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আইনে পার্থক্য কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

সূরা: আল-হুজুরাত

আয়াত নং :-10

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَیْنَ اَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

মু’মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও।আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।

তাফসীর :

এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে।হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার থেকে তিনটি বিষয়ে “বাইয়াত” নিয়েছেন। এক, নামায কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করবো। (বুখারী-কিতাবুল ঈমান)।হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী। (বুখারী--কিতাবুল ঈমান)। মুসনাদে আহমাদে হযরত সাঈদ ইবনে মালেক ও তার পিতা থেকে অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রত্যেক

মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম” (মুসলিম--কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী--আবুওয়াবুল বিরর ওয়াসসিলাহ)। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেনঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। (মুসনাদে আহমাদ) হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী নবীর ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট, ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। (মুসনাদে আহমাদ) অপর একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা.) বলেছেনঃ পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মু'মিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। (বুখারীও মুসলিম) আরো একটি হাদীসে নবীর ﷺ এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, মু'মিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। (বুখারী--কিতাবুল আদব, তিরমিযী--কিতাবুল বিরর--ওয়াস সিলাহ)

এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলিমকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে। জারীর ইবন আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে “বাই'আত” নিয়েছেন। ‘এক, সালাত কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।” [বুখারী: ৫৫]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।” [বুখারী: ৬০৪৪, মুসলিম: ৬৩] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।” [মুসলিম: ২৫৬৪, কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিয়ী: ১৯২৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। [মুসনাদে আহমাদ: ১৬/২৯৭, ৭৭৫৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৪০] অপর একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। [বুখারীঃ ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬]

আরো একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে । [বুখারী: ২৬৪৬, মুসলিম: ২৫৮৫] অন্য হাদীসে এসেছে, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করতে পারে না। আবার তাকে ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দিতে পারে না। [বুখারী:২৪৪২, মুসলিম:২৫৮০] অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে। [মুসলিম:২৬৯৯] হাদীসে আরো এসেছে, কোন মুসলিম যখন তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোআ করে তখন ফেরেশতা বলে, আমীন। (কবুল কর) আর তোমার জন্যও তদ্রুপ হোক। [মুসলিম: ২৭৩২]

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. মু'মিনদের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলে আপোষে মীমাংসা করে দেয়া ওয়াজিব।

২. মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের চেয়ে সুদৃঢ়।

৩. বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন আবশ্যক।

৪. আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন, ভালবাসা আল্লাহ তা'আলার একটি সিফাত।

৫. কবীরা গুনাহ করলেও মু'মিন ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা কবীরা গুনাহ, তারপরেও আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বললেন।